প্রবন্ধ

রঙ্গমঞ্চ ও শ্রীমা সারদাদেবী

স্বামী ঋতানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

তারাসুন্দরীর মায়ের কাছে আসার প্রথম বিবরণ দিয়েছেন স্বামী ভূমানন্দ। সেদিনই মা তাঁকে আপন করে নিয়েছিলেন। স্বামী ভূমানন্দ তাঁর রচনায় সে-ঘটনার সুস্পষ্ট ছবি এঁকে রেখেছেনঃ "সকালবেলা। বেশ কিছুক্ষণ আগে আটটা বেজে গেছে। শ্রীমা তখন ঠাকুরঘরে। সেসময় তাঁর কাছে রয়েছেন গোলাপ-মা, যোগেন-মা ও ডাক্তার অঘোরনাথ ঘোষের স্ত্রী। ডাঃ ঘোষ ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমায়ের কাছে মন্ত্র পেয়েছেন। সেদিন সকালে স্ত্রীকে সঙ্গে করে তিনি 'উদ্বোধন কার্যালয়' বা 'মায়ের বাড়ি'তে এসেছেন। তিনি স্ত্রীকে ওপরে শ্রীমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে নিচে স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে কথা বলছেন। শ্রীমা সবার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন। তারপর তিনি বলে উঠলেন, 'তোমরা একটু বোস, আমি এখুনি আসছি।'—এই কথা বলে তিনি সিঁড়ির দিকে এগোলেন।

"এর অল্পক্ষণ আগে একটা গাড়ি এসে থেমেছে এই বাড়ির সদর দরজার সামনে। গাড়ি থেকে নামলেন এক মহিলা। তাঁর বয়স সম্ভবত পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। তাঁকে দেখতে ভাল ছিল না বটে, কিন্তু চেহারা ও পোশাক-পরিচ্ছদে মার্জিত রুচি সুপরিস্ফুট। বাড়ির ভেতরে ঢুকে মহিলাটি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। তাঁর হাঁটা-চলাতে মনে হচ্ছিল, যেন তাঁর কতদিনের পরিচিত বাড়ি। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এদিন সকালেই তিনি প্রথম এবাড়িতে এসেছেন। মহিলাটি দোতলা পর্যন্ত গেলেন না। মাঝপথে সিঁড়ির রেলিংয়ের ওপর মাথা রেখে তিনি নীরবে কাঁদতে লাগলেন। শ্রীমা তাঁর কাছে এলেন। তিনি প্রথমে মহিলাটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, তারপর তাঁকে বুকে জড়িয়ে স্নেহসিক্তকণ্ঠে বললেন, 'ঠাকুরের এখানে যখন এসেই পড়েছ, তখন আর কান্না কেন?' শ্রীমার আশিসপূর্ণ কথায় মহিলাটির কান্না আরও বেড়ে গেল, তাঁর দুচোখ দিয়ে শ্রাবণের ধারার মতো জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সস্নেহে আঁচল দিয়ে তাঁর চোখের জল মুছে দিয়ে শ্রীমা নির্দেশ দিলেন, 'যাও, ঠাকুরের কাছে গিয়ে তাঁকে হাসিমুখে প্রণাম কর।'

"সেই মহিলাটি একজন সামান্যা রমণী নন, তিনি বঙ্গারঙ্গালয়ের প্রথিতযশা অভিনেত্রী তারাসুন্দরী। পাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত প্রেক্ষাগৃহে হাজারও দর্শকের বাহবা ও করতালিধ্বনি যাঁর অন্তরকে বিন্দুমাত্র নাড়া দিতে সমর্থ হয়নি কোনদিন, তিনি বাৎসল্যময়ী শ্রীমার অপার কল্যাণস্পর্শে একেবারে বিহ্বলা হয়ে পড়লেন। ঠাকুরপ্রণামের আদেশ শুনে তাঁর মনে পড়ল যে, এখনো শ্রীমাকেই প্রণাম করা হয়নি। তিনি তাড়াতাড়ি শ্রীমাকে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন, শ্রীমা তাঁর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে চিবুক স্পর্শ করে হাতে চুমো খেলেন। তারপর তিনি তাঁকে ঠাকুরঘর পর্যন্ত এনে ঠাকুরের ফটোর দিকে নির্দেশ করে বললেন, 'ঠাকুরকে প্রণাম কর।' তারাসুন্দরী ভক্তিনম্রচিত্তে ঠাকুরকে দূর থেকে প্রণাম করলেন।

"তারাসুন্দরী সেদিন মধ্যাহ্নে শ্রীমার পাশে বসে ঠাকুরের প্রসাদ পেয়েছিলেন। খাবার সময় শ্রীমার মুখে যা ভাল লাগছিল, তা তিনি তাঁকে খেতে দিচ্ছিলেন।"[৬১]

গভীর রাত্রে পদ্মবিনোদ কীভাবে শ্রীমায়ের দর্শনলাভ করেছিলেন তা আমরা দেখেছি। অন্তত আরেকবার তিনি এভাবেই মায়ের দর্শন পেয়েছিলেন। সেদিন তিনি রামলাল দাসদত্তের লেখা নিম্নোক্ত শ্যামাসঙ্গীতটি করেন—

"শ্মশান ভালবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি,
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি॥
আর কোন সাধ নাই মা চিতে,
চিতার আগুন জ্বলছে চিতে,
ওমা চিতাভস্ম চারিভিতে
রেখেছি মা আসিস যদি॥
মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে, রাখিয়ে মা পদতলে,
নেচে আয় মা তালে তালে, হেরি আমি নয়ন মুদি॥"

পরের দিন সকালে ভক্তেরা শ্রীমাকে রাতের বেলায় শয্যাত্যাগ করে ওভাবে উঠতে বারণ করলে বাৎসল্যময়ী শ্রীমা স্নেহভরে বলেনঃ "তা হোকগে বাবা! ওর ডাকে যে থাকতে পারিনে, তাই দেখা দিই।"

---

*বঙ্গারঙ্গামঞ্চের মহত্তম প্রেরণাদাতা তথা দর্শক শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর মহাসমাধির পর আনন্দরূপিণী শ্রীমা সারদাদেবীর রঙ্গালয়ে উপস্থিতি ও আশীর্বাদ শিল্পিমহলে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই শ্রীমা সারদাদেবীর অপার দাক্ষিণ্য ও রসবোধ বাংলায় রঙ্গমঞ্চ ও তার অপাঙ্‌ক্তেয় শিল্পিকুলকে নান্দনিক মর্যাদায় ভূষিত করে চির আশ্রয় দান করেছিল। কলকাতার গোলপার্কে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার-এর সন্ন্যাসী-কর্মী বর্তমান লেখকের গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের মাধ্যমে সেই সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।—**সম্পাদক***

তারপর পদ্মবিনোদকে আর দেখা যায় না। তাঁর বালক পুত্রের কাছে স্বামী সারদানন্দ জানতে পারেন, তিনি অসুস্থ। একদিন তাঁর বাড়ি গিয়ে সারদানন্দজী তাঁকে দেখে আসেন। উদরী হয়েছে। মহারাজের নির্দেশে তরুণ ভক্তেরা তাঁর সেবা করতে থাকে। ঐ অবস্থায় লুকিয়ে মদ খেয়ে খেয়ে রোগ বেড়ে গেলে তাঁকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে সার্জেন ব্রাউন সাহেব তাঁর অপারেশন করেন। ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল ও ডাঃ হাজরা এই কাজে সার্জেনকে সাহায্য করেন।

একদিন সেবাকার্যে নিযুক্ত আশুতোষ বাগবাজারের ভাড়াবাড়িতে শ্রীমার কাছে খেতে যেতে পারেননি। বেলা প্রায় চারটের সময় পদ্মবিনোদের ভায়রাভাই তাঁকে কিছু খাবার এনে দিলেন ও রোগীর শয্যার কাছে বসে বসে একঘেয়ে সময় কাটাতে 'কথামৃত'-এর একটি ভাগ পড়তে দেন।

রাত প্রায় একটার সময় পদ্মবিনোদ আশুতোষকে ডেকে বলেন ঃ "এখন একটা কাজ কর্ দোস্ত। ঠাকুরের কথা শোনা—আমার শেষ হয়ে এসেছে।" বিকেলবেলা পাওয়া 'কথামৃত' আশুতোষের হাতেই ছিল। তিনি বই খুলে যে-জায়গাটা পড়তে লাগলেন, সেখানে পদ্মবিনোদের উল্লেখ রয়েছে। 'কথামৃত'-এর পাঠ শুনতে শুনতে পদ্মবিনোদের আঁখিপদ্ম দিয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল আর একবার মাত্র 'রামকৃষ্ণ' নাম উচ্চারণের সাথে সাথে তাঁর প্রাণবায়ু দেহ পরিত্যাগ করল।

পরের দিন দুপুরে বাগবাজারের বাড়িতে ফিরে আশুতোষ খেতে খেতে শ্রীমাকে সমস্ত ঘটনা বললেন। সব শোনার পর শ্রীমা বলে উঠলেন ঃ "তা হবে না?—ঠাকুরের ছেলে যে! কাদা মেখেছিল, তা হয়েছে কী? যাঁর ছেলে, তাঁরই কোলে গেছে।" আশুতোষের সঙ্গে শ্রীমার কথা মেলে না। তাঁর বিশ্বাস, শ্রীমার অপার করুণাতেই এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। তিনি বললেন ঃ "আমি যা দেখেছি, যা জানি, তা-ই বলি। আমি জানি, আপনার দর্শন পেয়েছে—আপনি তাঁর প্রণামরূপ অর্ঘ্য গ্রহণ করেছেন, তাতে তাঁর এই পরিবর্তন হল আর আমিও ঐ দৃশ্য দেখে ধন্য হলাম।"[৬২]

জয়রামবাটীতে যাত্রার আসরে অনুকূলচন্দ্র মণ্ডলের অভিনয় শ্রীমা বহুবার দেখেছেন, সেকথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। জীবন-উপান্তে অনুকূল স্মৃতিচারণ করেছেন ঃ "অভিনয়জগৎ আমাকে ডেকেছিল। এর জন্য বাড়ির লোকের কাছে কম ভর্ৎসনা শুনতে হয়নি; তখন কী জানতাম যে, এই পথেই পৌঁছে যাব বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীর কাছে! অভিনয়ের সুবাদেই মাকে পেয়েছিলাম। আমি খুব ছোটবেলায় গর্ভধারিণী মাকে হারিয়েছিলাম। সে-দুঃখ ভিতরে জ্বলন্তই ছিল। যেদিন শ্রীশ্রীমার দর্শন হলো, সেদিন থেকে যেন আমার হারানো-মাকে আবার ফিরে পেলাম! মায়ের কাছে এসেই ঠাকুরকে চিনতে শিখেছি, ভাবতে পেরেছি। মায়ের ছোঁয়ায় জীবন ধন্য হয়েছে। মা দীক্ষা দিয়ে অন্তরের তীব্র দহনকে শীতল করেছেন। স্ত্রী, পুত্র সকলেই মায়ের আশীর্বাদ লাভ করে ধন্য হয়েছে।"[৬৩]

শ্রীশচন্দ্র মতিলাল (১৮৭৫-১৯৩৪) বউবাজারের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। অল্পবয়স থেকেই বিভিন্ন নাট্যমঞ্চে থিয়েটার দেখতেন। সেই সূত্রে, বয়সে গিরিশচন্দ্রের থেকে অনেক ছোট হলেও তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন হয়ে উঠেছিলেন। শ্রীশচন্দ্রের অনুরোধে গিরিশচন্দ্র 'বিশ্বামিত্র' ও পরে 'তপোবল' লিখেছিলেন। শ্রীশচন্দ্রকে গিরিশচন্দ্র শ্রীমায়ের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে শ্রীশচন্দ্র নিয়মিত মায়ের বাড়ি যাতায়াত করতেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী মায়ের কাছে দীক্ষালাভ করেছিলেন। ভক্ত গিরিশচন্দ্র ও রঙ্গমঞ্চের জগতে তাঁর অসাধারণ প্রভাব তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শ্রীশচন্দ্র লিখেছেন ঃ "গিরিশের প্রবল বিশ্বাসের সংক্রামক শক্তিতে রঙ্গালয়ের সকল ব্যক্তিই প্রায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে মান্য করিতে শিখিয়াছিল।"[৬৪]

"ঠাকুরের জগতের সকলের প্রতি মাতৃভাব ছিল"

কুমুদবন্ধু সেনের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে গিরিশবাবু একদিন বলেছিলেন ঃ "দেখ, আমি যখন ঠাকুরের শ্রীচরণে আশ্রয় পাই, তখন থিয়েটার ছাড়বার এক একবার ঝোঁক হতো। কিন্তু ঠাকুর ছাড়তে চাইলেই বলতেন, 'না, না থাক—ওতে অনেক উপকার হচ্ছে।' এর মর্ম আমি তখন বুঝতে পারিনি। এখন মনে হয়, আমি নিজে কিছু করছি না, তাঁরই কাজ করছি। নাটকে তাঁরই ভাবের প্রচার হচ্ছে। আর রঙ্গালয় পতিত-পতিতার আশ্রয়।"[৬৫] [ক্রমশ]

তথ্যসূত্র

৬১ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনকথা—স্বামী ভূমানন্দ, ২০০১, পৃঃ ১৯৩-১৯৪
৬২ শ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ ১৬৩; শ্রীমা—আশুতোষ মিত্র, ১৯৪৪, পৃঃ ৬৭-৭৩; বঙ্গরঙ্গালয়, পৃঃ ২৮-২৯
৬৩ শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০৪৩-১০৪৪
৬৪ সকলের মা মা সারদা—নিমাইসাধন বসু, পুনশ্চ, ২০০৪, পৃঃ ২০৯
৬৫ গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি—কুমুদবন্ধু সেন (উল্লিখিত—শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ, পৃঃ ৬০)